অধ্যায় ১৪ : বাংলার কয়েকজন সফল চিত্রনাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিন্যাসক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪.২ পরিচিতি

১৪.৩ বাংলা চিত্রনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৪.৪ বাংলার ব্যতিক্রমী চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন

১৪.৫ সত্যজিৎ রায় ও তাঁর চিত্রনাট্য

১৪.৬ সফল পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ঋত্বিক ঘটক

১৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

১৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

১৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বাংলা চিত্রনাট্যের ধরণ বিষয়ে জানতে পারবেন।
- বাংলা চিত্রনাট্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হবেন।
- বাংলার বিখ্যাত সব চিত্রনাট্যকার বিষয়ে জানতে পারবেন।

১৪.২ পরিচিতি

নির্বাক যুগে যখন চিত্রনাট্যের মধ্যে সাবটাইটেল জুড়ে দেওয়া থাকত, তখন অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারেরা চিত্রনাট্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন না। তাই নির্বাক যুগ ও সবাক যুগের প্রথম পর্বে অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারেরাই মঞ্চরীতির আদলে চিত্রনাট্য রচনা করতেন। এতসব সত্ত্বেও নির্বাক যুগে চিত্রনাট্য লেখার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দেবকী কুমার বসু। প্রায় এই পর্বের বিখ্যাত চিত্রনাট্যকারেরা হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, মধু বসু, সুশীল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ। এঁদের মধ্যে প্রমথেশ বড়ুয়া 'দেবদাস' এবং মন্মথ রায় 'চাঁদ সদাগর' ছবিতে অসমান্য চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এরপর বাংলার বিখ্যাত চিত্রনাট্য নাট্যকার তুলসী

লাহিড়ী কৃত 'হ্যাপি ক্লাব' শীর্ষক কমিক চলচ্চিত্র। এই চিত্রনাট্যটি ১১ জুলাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'সাহানা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে শুরুর দিন থেকে বাংলা সিনেমাকে তার উৎকৃষ্ট নির্মাণের ঘনত্বে যে সকল সিনেমা খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছে, সেগুলি হল-'দেবদাস', মুক্তি', 'ছিন্নমূল', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'চারুলতা', 'সুবর্ণরেখা', 'জীবন সৈকতে', 'আকালের সন্ধানে, 'গঙ্গা', 'সংসার সীমান্তে', 'সাত পাকে বাঁধা', 'চলাচল', 'দ্যুতীমান পৃথ্বীরাজ', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'ময়না তদন্ত', 'যুগান্ত', 'চোখ', উৎসব', 'মনসুর মিঞার ঘোড়া', 'একটি জীবন', 'কোনি', 'দামু', 'মহাপৃথিবী', 'অনু', 'শূন্য থেকে শুরু', 'তালনবমী' প্রভৃতি। যাদের বেশিরভাগ সাহিত্যকে আশ্রয় করেই জন্মলাভ করেছে। যেমন 'কোনি' সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসকে আশ্রয় করে। তবে এই সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্যের পাশাপাশি বাংলা সিনেমার আরেকটি ধারা হল পপুলার সিনেমার ধারা। সোজা কথায় বললে বর্তমানে চটকদার সিনেমার ধারা। চারের দশক থেকেই এই ধারা সমান্তরালভাবে চলে আসছে বাণিজ্যিক ছবি নাম নিয়ে। এই ছবিগুলির চিত্রনাট্য রচিত হত মূলত মনোরঞ্জক উপাদানকে প্রাধান্য দিয়ে। পশ্চিমী সংস্কৃতির ধারায় উদ্ধত বাজনাবহুল গান আর বারোয়ারী হাততালি কুড়নো সংলাপকে জায়গা করে দিয়ে এই সব সিনেমার চিত্রনাট্য লেখা হয়। গান আর সংলাপ মিলে সিনেমা। ফলত কাহিনির সরসতার থেকে এই সকল চিত্রনাট্য চটকদার গান ও সংলাপকে জায়গা করে দিয়ে নির্মিত হতে লাগল। এর ওপর উপরি হিসাবে যোগ হতে হত কমেডি। হয়তো বা মূল কাহিনির সঙ্গে সেই কমেডির কোন যোগই থাকত না। এসব সত্ত্বেও কিন্তু এইসকল পপুলার সিনেমা যে একেবারে তাচ্ছিল্য করার বিষয় তা কিন্তু নয়। বিশেষত পাঁচের দশকে 'শাপমোচন', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'বালুচরী', 'তিন ভুবনের পারে', 'চৌরঙ্গী' উল্লেখযোগ্য পপুলার সিনেমা। সে যা হোক বাংলা চিত্রনাট্যের মান উন্নয়ন শুরুর দিনগুলো বাদ দিলে মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের হাতেই। পরবর্তীতে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ, অপর্ণা সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারের মতো চিত্রনাট্যকারেরা।

১৪.৩ বাংলা চিত্রনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বংলা চিত্রনাট্য গঠনের দিক দিয়ে দুই ধরনের হয়, এক মৌলিক ও দুই সাহিত্যাশ্রিত। বাংলা সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্যের অন্যতম রূপকার সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ। যদিও মৃণাল সেন মূল লেখার প্রতি সত্যজিৎ রায়ের মতো আনুগত্য প্রদর্শন করতে রাজি ছিলেন না। তিনি নিজের মতো কাজ করার একটি জায়গা খুঁজে নিতেন, আর সত্যজিৎ রায় সাহিত্যে অনুগতে থেকেই চলচ্চিত্রীয় ভাবনার অতলে ডুব দিতেন। এক্ষেত্রে সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য হওয়া সত্ত্বেও এই দুজনের পৃথক দর্শন চলচ্চিত্র নির্মাণে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতো। অন্যদিকে ঋত্বিক ঘটক হলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বিদ্রোহী পরিচালক।

বাংলা ছবির আদিতে চিত্রনাট্যের কোনো বালাই ছিল না। হলিউড প্রভাবমুক্ত এই সময়ের ছবিগুলির প্রধান বিষয় ছিল দুটি; পৌরাণিক ও সামাজিক। পৌরাণিক ছবিগুলির বিষয় গ্রহণ করা হতো

বিভিন্ন পুরাণ থেকে আর সামাজিক কাহিনির যোগান আসতো বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে। উপন্যাসের পাতায় লাল কালিতে দাগ দিয়ে সংলাপ চিহ্নিত করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় করে বলতে বলা হত। উপন্যাস আর ছবির গল্প চলত সমান্তরাল। ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই কারণে কপালকুণ্ডলা ছবি দেখ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন "উপন্যাস থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে ম্যাডান কোম্পানি যতগুলি ফিল্ম তৈরি করেছেন সবগুলিই সিনারও-র দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে।" ফিল্মের জন্য নতুন ও তদনুযায়ী সাহিত্যই রচিত হওয়া উচিত। তাঁর মতে পর্দা ও পুথির পাতা এক নয়। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের শেষ থেকে বাংলা ছবির চিত্রনাট্য একটু একটু করে সংহত হতে থাকল। শিথিলতাও কিছু কম দেখা গেল। শুরু হলো নিউ থিয়েটার্স যুগ। চিত্রনাট্য রচনা যে প্রয়োজন তা টের পেতে থাকলেন পরিচালকেরা। এই সময়ে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' (১৯৩৭) এবং বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবি দুটি বাংলা ছবির ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়েছিল চিত্রনাট্যের গুণে। এছাড়াও 'বসু পরিবার', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবির চিত্রনাট্য ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রাক্ 'পথের পাঁচালী' পর্বে 'কল্পনা', 'ছিন্নমূল', 'নাগরিক' এই তিনটি ছবির চিত্রনাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক সিনেমা ভাবনায় নতুন মাত্রা দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায় থেকে বাংলা ছবির চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব মূলত পরিচালকেরাই নিতে শুরু করেন। কিন্তু চার ও পাঁচের দশকে চেহারাটা অন্যরকম ছিল। পেশাদার চিত্রনাট্যকার হিসাবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় খ্যাতি অর্জন করেন। সেসময়ের কথাসাহিত্রিকেরাও তাঁদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে চিত্রনাট্য রচনায় এগিয়ে আসেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দি ও বাংলা ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর প্রমুখও এই কাজে যুক্ত ছিলেন। মধু বসুর চিত্রনাট্যের সংশোধনের কাজও তিনি করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বাংলা সিনেমার চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনার কাজে যুক্ত হয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিতের মতো বিখ্যাত লেখকেরা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাংলা চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৪ বাংলার ব্যতিক্রমী চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন

পদার্থবিদ্যায় স্নাতক, প্রথম জীবনে মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভের কাজ করা মৃণাল সেন ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় সিনমো জগতের বিস্ময়কর স্রষ্টাদের মধ্যে একজন। সময়ের উন্মত্ততাকে নিজের সিনেমার ক্যানভাসে ধরে রাখার অনবদ্য কারিগর চিত্রনাট্যকার-পরিচালক মৃণাল সেন ছিলেন ভারতীয় বাণিজ্যিক ধারার বাইরে ব্যতিক্রমী ধারার চিত্রনাট্য নির্মাতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। তাঁর প্রথম ছবি রাতভোর' (১৯৫৬) থেকে 'আমার ভুবন' (২০০২) পর্যন্ত তিনি সাতাশটি ছবি নির্মাণ করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে,

সময়ের সঙ্গে বদলেছে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু, পাল্টেছে আঙ্গিক, পরিবর্তিত হয়েছে পটভূমি। মৃণাল সেন চিত্রনাট্য রচনা করেন জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থোকে। তাঁর চিত্রনাট্যে স্থান পায় রাজনীতি, সময় আর মধ্যবিত্তের স্বার্থান্বেষী অবস্থান। 'পদাতিক', 'কোরাস', 'মৃগয়া' 'পরশুরাম' ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আশীষ বর্মণ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর লেখার ভাবনাটাও ভিন্ন রকম। তিনি সত্যজিতের মতো পরিপাটি করে নন, বরং ঋত্বিকের মতো অগোছালোভাবে চিত্রনাট্য রচনায় তিনি সর্বাধিক আকর্ষণবোধ করতেন। এই রীতিটিই তাঁর রচিত চিত্রনাট্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মৃণাল সেন কোনও দিন খুব গুছিয়ে কোনও জিনিস রাখতে পারতেন না। শোনা যায় একসময় বাড়ি বদলের দিন আন্তর্জাতিক পুরস্কার পুরনো-জিনিস বিক্রিওয়ালাকে প্রায় দিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের চিত্রনাট্য ব্যাপারেও তিনি শেষ পর্যন্ত কাজ করে যেতেন। তার ছেলে কুণাল সেন জানিয়েছিলেন যে মৃণাল সেন শুটিং ফ্লোরে পর্যন্ত চিত্রনাট্যের প্রচুর রদ-বদল ঘটাতেন। আর তাঁর চিত্রনাট্য রচনার বৈচিত্র্য ছিল, আসলে সত্যজিৎ রায়ের পাশাপাশি তিনিও ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন।

মৃণাল সেনের 'কোরাস' ছবির চিত্রনাট্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি দীর্ঘ লাইনের অভিজ্ঞতা থেকে রচিত হয়। ঠিক যেমন তাঁর 'কলকাতা ৭১' শুরু হয় কুড়ি বছরের একটি ছেলের ভয়ঙ্কর দৌড় দিয়ে কিংবা 'পদাতিক' শুরু হয় জেমস ক্যামেরনের একটি লেখা দিয়ে। মৃণাল সেন ব্যক্তিজীবনে বারংবার মনে করেছেন যে শুধু শব্দ দিয়ে চিত্রনাট্য লেখা যায় না। চিত্রনাট্য মূলত লিখতে হয় ইমেজ বা দৃশ্য দিয়ে। তিনি মূলত নিজে এই কাজটি করে গেছেন তাঁর নির্মিত চিত্রনাট্যগুলোতে। 'তাহাদের কথা', 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান', 'লাল দরজা', 'চরাচর', 'টোপ' তার উদাহরণ। সুররিয়ালিস্টিক ইমেজ আর কবিতার মতো চিত্রকল্পে ভর দিয়ে এগিয়ে চলে তাঁর চিত্রনাট্য। ছবি তৈরির আগে চিত্রনাট্য লেখা হয় আর সম্পাদনার স্তরে গিয়ে তার অনেক পরিবর্তন ঘটে। বদলে যেতে যেতে আলো-ছায়ার মধ্যে সিনেমাটির নিহিতার্থ পুরোনো ইঙ্গিতের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে অন্য ইঙ্গিত পায়। মৃণাল সেন চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের প্রতি আনুগত্যের দায় অনুভব করেনচলচ্চিত্র নামক শিল্প ,লেখকের ভাবনার প্রতি-প্রতি এবং বর্তমান সময়ে মাধ্যমেরর প্রতি। সাধারণ ভাবে চিত্রনাট্যা হল আখ্যান। তবে মৃণাল সেন বর্ণনাধর্মী আখ্যান পরিত্যাগ করে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে জোড়া দেন।

মূলত সত্তরের দশকের গোড়াতে বাঁক পরিবর্তন করা মৃণাল সেনের ছবিতে তিনি গল্প বলাকে পরিহার করেন। ঘটনার চেয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্যের ওপর আলো ফেলেছেন বেশি। একসময় তাঁর উপর বার্টল্ট ব্রেশটের প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। ব্রেশটের 'লেয়ার স্টুক' বা 'শিখন-নাটক'-এর মতো তাঁর ছবিগুলিও হয়ে ওঠে শিক্ষণীয়। আসলে আঙ্গিকের জন্য তিনি ব্রেশটের কাছে যান। 'ইন্টারভিউ' ছবিতে তিনি ব্রেশটের থিয়েটারীয় কৌশলকে পর্দায় নামিয়ে আনেন। আসলে ব্রেশটের মতো তাঁরও লক্ষ্য ছিল দর্শকদের সচেতন করা অভিভূত করা নয়। ছবিকে চিত্রগ্রাহী করার থেকে দর্শকের চেতনার মর্মমূলে নাড়া দেওয়া ছিল তাঁর কাছে বেশি জরুরী। তাই 'খারিজ' দেখে বালক ভৃত্য পালনের মৃত্যুতে দর্শক যত ব্যথিত হন, আপন গৃহ ভৃত্যের প্রতি নিজের আচরণের কথা ভেবে বিব্রত হন অনেক

বেশি। বক্তব্য প্রধান হলেও মৃণাল সেনের চিত্রনাট্য তাঁর প্রতিভা ও উন্নত শিল্প-চেতনার স্পর্শে উৎকৃষ্ট শিল্পে পরিণত হয়। চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনিই তিনি বেছে নিতেন। এটা লক্ষণীয় যে তিনি অন্যদের মতো রবীন্দ্রনাথ বা সে সমকালের অন্য কোনো সাহিত্যিকের কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকে চিত্রনাট্যরূপ দেননি। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের চোখ দিয়ে সমাজ বা জীবনকে দেখেননি। আসলে তিনি চাইতেন যে কাহিনি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত বাহন হবে তাকেই তিনি চিত্রনাট্য রূপ দেবেন।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাংলা চিত্রনাট্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোকপাত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৫ সত্যজিৎ রায় ও তাঁর চিত্রনাট্য

হরিসাধন দাশগুপ্তের 'A Perfect Day' (১৯৪৮) শীর্ষক ডকুমেন্টারি দিয়ে চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায়ের আত্মপ্রকাশ, যা 'পথের পাঁচালির (১৯৫৫) আত্মপ্রকাশের বেশ অনেকটাই আগে। প্রত্যেক পরিচালক বা চিত্রনাট্যকারের চিত্রনাট্য রচনার ভিন্ন রীতি আছে। সত্যজিতের চিত্রনাট্য বললেই আমাদের সামনে ভেসে আসে লাল খেরোর খাতা, ছবি, আঁকিবুকি, রঙিন দৃশ্য নির্মাণ। কিন্তু সে তো উপকরণ। তাঁর চিত্রনাট্য নির্মাণের আসল কথা বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন- 'কথা ও চিত্রকলা উভয়ের সমবায়ে যে অভিনব একটি শিল্প মাধ্যম হয় তার নিদর্শন মেলে আমাদের বাংলা ভাষায় একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের মধ্যে। সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যে ক্যামেরার মাধ্যমে পর্দায় যে ঘটনা প্রতিফলিত হবে, তার কিছু কিছু স্কেচ এঁকে দেন। তার ফলে তাঁর চিত্রনাট্যগুলি কথামালা ও চিত্রমালার সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষাশিল্প হিসাবে গন্য হতে পারে।" (বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র, ১ম খন্ড, পৃ-২৬৭) অন্য কেউ নন, তাঁর নিজের ছবির চিত্রনাট্য অন্য কেউ লিখুন চাননি সত্যজিৎ। তাই তার পরিচালিত প্রায় সবকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য তিনি নিজেই লিখেছিলেন। এই ঘরানা পরবর্তীতে বজায় থেকেছে বাংলা ছবিতে। তিনি মনে করতেন চিত্র পরিচালকদের নিজেদেরই চিত্রনাট্য রচনা করা উচিত। কারণ "পরিচালক যদি সচেতন শিল্পী হন, তবে তাঁর রচনার দোষগুণ তাঁর নিজের কাছে অজানা থাকে না। দোষের জন্য নিন্দা এবং গুণের জন্য প্রশংসা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য।" (বিষয় চলচ্চিত্র,পৃ-৭২) বলেছেন বাংলার মানিক। সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক হিসাবে স্বাধীনতা নেন তিনি আবার এটাও ভোলেন না যে একটা কোনো সাহিত্যিকের গল্প তাকে তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন মাত্র। চিত্রনাট্য রচনাকে সত্যজিৎ অনুবাদ মনে করেন না, মনে করেন নতুন ব্যাখ্যা, অন্য মাধ্যমে নতুন করে সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যদি 'নষ্টনীড়' না লিখতেন তবে তো 'চারুলতা' তৈরি হতো না বলে মনে করেন তিনি। চিত্রনাট্যকে তিনি শুধু নতুন করে সৃষ্টি করেন না, তাকে সাজিয়ে তোলেন। এই সাজানোটা আমরা লক্ষ করি তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকে। দৃশ্য নির্দেশ, শট বিভাজন, আবহ, সংলাপ প্রভৃতির পাশাপাশি

থেকেছে দৃশ্য অনুযায়ী স্কেচ। চরিত্রদের পোশাক, সেট ডিজাইন। চিত্রনাট্যেই ছবি যেন মূর্ত হয়ে উঠত। এক্ষেত্রে পাঠকেরা নিশ্চিত স্মরণ করবেন তাঁর 'পথের পাঁচালী', 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'হীরকরাজার দেশে' প্রভৃতি চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য লেখাটা সত্যজিৎ রায়ের কাছে ছবি তোলার মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্য রচনার নিরিবিলি পরিবেশ পেতে চলে যেতেন পুরী, গোপালপুর, এমনকি নেপালও! চিত্রনাট্যে সংলাপ লিখে রাখতেন সত্যজিৎ। প্রয়োজনে শুটিং ও চরিত্রের দরকারে সংলাপ একটু বদলেও নিতেন। কিন্তু তাঁর চিত্রনাট্যে সংলাপ পরিমিত। বাংলা ভাষায় সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'সোনার কেল্লা', 'অপরাজিত', 'নায়ক', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রভৃতি চিত্রনাট্য সম্পদ বলে বিবেচ্য। ১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মোট ২৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, ২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র এবং বেশকিছু তথ্যচিত্র করেছেন সত্যজিৎ রায়। পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রগুলো হলো-১. পথের পাঁচালী (১৯৫৫), ২. অপরাজিত (১৯৫৬), ৩. জলসাঘর (১৯৫৮), ৪. পরশপাথর (১৯৫৮), ৫. অপুর সংসার (১৯৫৯) ৬. দেবী (১৯৬০) ৭. তিনকন্যা-পোস্টমাস্টার, মণিহারা, সমাপ্তি (১৯৬১), ৮. কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২), ৯. অভিযান (১৯৬২), ১০. মহানগর (১৯৬৩), ১১. চারুলতা (১৯৬৪), ১২. মহাপুরুষ (১৯৬৪), ১৩. কাপুরুষ (১৯৬৫), ১৪, নায়ক (১৯৬৬), ১৫. চিড়িয়াখানা (১৯৬৭), ১৬. গুপি গাইন বাঘা বাইন (১৯৬৮), ১৭. প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০), ১৮. অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৭০), ১৯. সীমাবদ্ধ (১৯৭১), ২০. অশনি সংকেত (১৯৭৩), ২১. সোনার কেল্লা (১৯৭৪), ২২. জন অরণ্য (১৯৭৪), ২৩. সতরঞ্জ কি খিলাড়ি (হিন্দি) (১৯৭৭), ২৪. জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮), ২৫. হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), ২৬. ঘরে বাইরে (১৯৮৪), ২৭. গণশত্রু (১৯৮৯), ২৮. শাখা প্রশাখা (১৯৯০), ২৯. আগন্তুক (১৯৯১)। স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্রগুলো হল-১(১৯৮২) পিকু .২ ,১৯৮১ সঙ্গতি., আর তাঁর তথ্যচিত্রগুলো হল-১(১৯৪৮) দ্য পারফেক্ট ডে ., ২. রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), ৩. সিকিম (১৯৭১), ৪. দি ইনার আই (১৯৭২), ৫. বালা (১৯৭৬), ৬. সুকুমার রায় (১০৮৭)। তাঁর প্রত্যেকটি চিত্রনাট্যা সাহিত্যাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও তার মৌলিক দৃষ্টিকোণ চিত্রনাট্যগুলিকে অনন্য পর্যায়ে উন্নিত করেছে।

একটি চিত্রনাট্য নির্মাণ ও তাকে রূপ দেবার পূর্বে সত্যজিতের পরিকল্পনাটি ছিল তার সফল চলচ্চিত্র নির্মাণের চাবিকাঠি। যেমন ধরা যাক 'পথের পাঁচালী' সিনেমায় ইন্দির ঠাকুরণ চরিত্রটির নির্বাচন ক্ষেত্রটিকে। কাহিনি ও ভাবকে ফলপ্রসু করতে সেদিন সত্যজিৎ খুঁজে বেরিয়েছিলেন এমন একজন চরিত্রকে যিনি তাঁর ভাবনার দোসর হয়ে ওঠেন। বিভূতিভূষণ ইন্দির ঠাকুরণের যে বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন- "পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ইষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দূরের জিনিষ আগের মত চোখে ঠাহর হয় না।" (পথের পাঁচালী, পৃ-২) সেই বর্ণনানুয়ারী সত্যজিৎ রায় অভিনেত্রী খুঁজতে লাগলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল এই বলে "এ ছবিতে মেক-আপ ব্যবহার করা হবে না।" (বিষয় চলচ্চিত্র, পৃ-১০০) তবুও অমিল কিন্তু প্রত্যয়ী সত্যজিৎ কিছুতেই তাঁর চিন্তনকে সমঝতা করতে দিলেন না। অবশেষে চুনিবালা দেবীর খবর নিয়ে আসেন 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে সেজোঠাকুরণের ভূমিকায় অভিনয় করা রেবা দেবী। আর তাঁকে পেয়ে বাংলা মানিকের

অভিব্যক্তি- "চুনিবালা আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।'... বর্ণনার সঙ্গে অমিল হোল না।" (বিষয় চলিচ্চিত্র,পৃ-১০০) সুতরাং নিজের কাজ প্রসঙ্গে এরকম অধ্যবসায় ছিল সত্যজিৎ রায়ের তা সে আখ্যান থেকে শুরু করে উপস্থাপন পর্যন্ত।

১৪.৬ সফল পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ঋত্বিক ঘটক

ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত থাকা ঋত্বিক ঘটক বাংলা সিনেমা জগতের এক অনবদ্য প্রতিভা। তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'নাগরিক' মুক্তি পায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। চিত্রনাট্যকার ঋত্বিক ঘটক এ বিশেষ অবস্থান থেকে তাঁর চিত্রনাটা রচনায় আত্ম-নিয়োগ করতেন। আসলে সেই বিশেষ বোধ ঋত্বিককে তাড়িত করত চিত্রনাট্যা রচনায়। একবার এক প্রযোজকের বাড়ি গেছেন ঋত্বিক ঘটক উদ্দেশ্য তাকে নিজের স্ক্রিপ্ট শোনানো। ঋত্বিক কাঁধের ব্যাগ থেকে বের করলেন খাতা আর পাতার পর পাতা উল্টে পড়ে চললেন চিত্রনাট্য। দৃশ্য, শট, ক্যামেরার অবস্থান, সংলাপ সহ সাবলীল ভঙ্গিতে। কৌতূহলবশত প্রযোজক খাতাটি চেয়ে নিয়ে দেখলেন পাতাগুলি সব সাদা। ঋত্বিক মুচকি হাসছেন। প্রযোজক তো অবাক। এই হলো ঋত্বিক। এ তো গ্রিফিথের মতো। যিনি কখনো লিখিত চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করেননি। এটা কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে ধরা থাকত। অনেক এমন পরিচালক আছেন যাঁরা এইরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করেন।

সাহিত্য অবলম্বনে ঋত্বিক চিত্রনাট্য রচনা করলেও তিনি মনে করতেন ও মানতেন ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ। সাহিত্যগন্ধী চলচ্চিত্র বোধের বদলে তাঁর ছবির চিত্রনাট্য নন-ন্যারেটিভ। 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো'তে তা হয়ে যায় অ্যান্টি-ন্যারেটিভ। মেলোড্রামা তাঁর হাতিয়ার আর বক্তব্য তাঁর দর্শন। 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা'-জীবন ব্যাখ্যার ভূমিকায় ঋত্বিক ও তাঁর চিত্রনাট্য। তিনি মনে করেন চিত্রনাট্যকারকেও সমাজসচেতন হতে হবে। তাঁর 'সুবর্ণরেখা' ছবির গল্পে ভাঙা এরোড্রাম বা বহুরূপী ছিল না। অথচ ছবিতে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়েছে।

তবে ব্যক্তিজীবনে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন অত্যন্ত রসিক মানুষ। সারাজীবন যিনি উদ্বাস্তু সমস্যা এবং দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করে গেলেন তিনি যে কী পরিমাণ রসিক ছিলেন তার পরিচয় পাই তাঁর নির্মিত কমেডিধর্মী চিত্রনাট্যগুলিতে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় তাঁর অসমাপ্ত চিত্রনাট্য 'বগলার বঙ্গদর্শন'। সেইসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় এক বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে যেমন তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা'য় তিনি শব্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় হংসধ্বনি রাগ ও এ রাগভিত্তিক খেয়াল তিনি ব্যবহার করেন চলচ্চিত্রের আবহসংগীত নির্মাণে। এছাড়াও এই ছবিতে ঋত্বিক ঘটক প্রথমবারের জন্য রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করেন। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের লোকসংগীতের ব্যবহার

লক্ষণীয়। নাট্যকারের জাত প্রতিভা নিয়ে জন্ম লাভ করা ঋত্বিক ঘটক একসময় কিছু সীমাবদ্ধ দর্শকের চৌহদ্দি পেরিয়ে পৌঁছে যেতে চেয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ দর্শকের দরবারে, তাঁর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালক রূপে তার সার্থক প্রয়োগ তাঁর এই মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করে তুলেছিল।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। বাংলার যেকোনো একজন সফল চিত্রনাট্যকারের বিষয়ে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

একবিংশ শতক থেকে বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে অনেকখানি। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় যেমন বাংলা ছবির অন্ধকার সময় গেছে ঠিক তেমনি বিগত দশ বছর থেকে তার অধঃপতন আবার সেই অন্ধকারকেই স্মরণ করাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে এই চিত্রটি কিছু পাল্টেছে, এটা আশার কথা। নতুন শতকের দুই দশকে ভালো ছবি ও পপুলার ছবির ভেদ অনেকখানি মুছে দিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলি, কমলেশ্বর মুখার্জি, শিবপ্রসাদ মুখার্জি ও নন্দিতা রায়, অনিকেত চট্টোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ, সুজিত মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো কিছু চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা এই সময়ে পেয়েছি 'শব্দ', 'সিনেমাওয়ালা', 'বিসর্জন', 'অটোগ্রাফ', 'জাতিস্মর', 'বেলাশেষে', 'রামধনু', 'ময়ূরাক্ষী', 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'সহজ পাঠের গল্প', 'বাকিটা ব্যক্তিগত' প্রভৃতি ছবি। এই ছবিগুলির চিত্রনাট্য খুবই শক্তিশালী। গৌতম ঘোষ এই সময়ে 'শঙ্খচিল' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্রনাট্য লিখেছেন যা প্রকাশিতও হয়েছে। তবু অন্ধকারকে তো একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। এতসবের পরেও বাংলা সিনেমার জগতে বাংলা পপুলার ছবির নামে আমাদের যা দেওয়া হচ্ছে তাতে না আছে বিনোদন, না আছে রুচি। যে বাংলা সিনেমা সাহিত্যকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্রের ভাষায় পৌঁছতে চাইত, যার চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত উচ্চ মনের লেখকেরা। তার এই বিপথগামীতা সাহিত্যানুরাগীদের কাছে মেনে নেওয়া কষ্টকর। বর্তমান পপুলার বাংলা ছবি বলে যা যোগান দেওয়া হচ্ছে তা আসলে রুচিহীন স্থূল বিনোদন। এর ফলে সৃজিত, কৌশিক, অতনু, মৈনাক, কমলেশ্বর যে চিত্রনাট্যে ভর দিয়ে ছবি করছেন তা আপামর দর্শকের কাছে পৌঁছুতে পারছে না। বাংলা ছবির চিত্রনাট্য বাংলা ছবির সম্পদ। এই সম্পদ দীর্ঘ দিন বাংলা ছবিকে লালন করেছে। সে সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য হোক অথবা মৌলিক। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তো চিত্রনাট্য হিসাবে এখনও সিনেমার ছাত্র, পাঠক, দর্শকের কাছে আদর্শ। কী করে ভালো চিত্রনাট্য লিখতে হয় এ তারই নিদর্শন। তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার, অজয় কর, পার্থপ্রতিম, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণদের চিত্রনাট্য পাঠ্য সাহিত্য হিসাবেও নান্দনিক। ফলত বাংলা চিত্রনাট্যের গতি বদল কিন্তু বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের

কাছ থেকেই কাম্য। সাহিত্য বঞ্চিত চিত্রনাট্য যে একদিন কালের স্রোতে হারাবে সে নির্মম সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে বাংলার এক সম্পন্ন চিত্রনাট্য লেখার সংস্কৃতিও। যদিও অদূর ভবিষ্যতে চিত্রনাট্যের ডিজিটালাইজেশনের ফলে চিত্রনাট্যের যে প্রিভিসুয়ালাইজেশন ব্যবস্থার বিকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে চিত্রনাট্য কতটা উপকৃত হবে তা সময়ই উত্তর দেবে। তবে চিত্রনাট্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ লিখনকর্ম, সাহিত্যকর্মেরই মতো তাই সেখানে নির্দিষ্ট ভাবে সাহিত্যিক রহস্যভেদ হয়তো চিত্রনাট্যের নান্দনীকতার পক্ষেই হানিকর।

জেনে রাখা ভালো

প্রিভিসুয়ালাইজেশন হল- কোনো দৃশ্যকে যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, বাস্তবে তা পর্যায় কী রূপ নেবে, দৃশ্যায়িত হবার আগেই সেটা প্রাক্ দর্শন করে নেওয়া।

১৪.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বাংলা শিল্প জগতের অন্যতম সংযোজন চিত্রনাট্য বিষয়ে জানতে পারলাম এবং তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মনে রাখতে পারলাম।
- বাংলা চিত্রনাট্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন বিষয়ে অবগত হলেন।
- সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য ধরন সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান ধারণ করলেন।
- ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর চিত্রনাট্য কৌশল সম্পর্কে জানতে পারলেন।

১৪.৯ অতিরিক্ত পঠন

- দাশগুপ্ত, ধীমান (২০২০); চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ; কলকাতা : বাণীশিল্প
- দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৯); সিনেমার অ আ ক খ; কলকাতা : বাণীশিল্প
- দাশগুপ্ত, ধীমান (১৯৯৩); সিনেমার আঙ্গিক; কলকাতা : বাণীশিল্প
- রায়, সত্যজিৎ (২০১৪); বিষয় চলচ্চিত্র; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
- রাউত, সৈকত (২০২৩); প্রসঙ্গ : চিত্রনাট্য; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- সাহা, মানবেন্দ্রনাথ (২০১২); চিত্রনাট্য সাহিত্যের নতুন ভুবন; কলকাতা : প্রতিভাস

১৪.১০ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর : বংলা চিত্রনাট্য গঠনের দিক দিয়ে দুই ধরনের হয়, এক মৌলিক ও দুই সাহিত্যাশ্রিত। ..... এক্ষেত্রে সাহিত্যাশ্রিত চিত্রনাট্য হওয়া সত্ত্বেও এই দুজনের পৃথক দর্শন চলচ্চিত্র নির্মাণে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতো।.....বাংলা ছবির আদতে চিত্রনাট্যের কোনো বালাই ছিল না। (দ্রষ্টব্য ১৪.৩ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর : সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে গৌতম ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলীদের নিয়ে এই উত্তর নির্মাণ করতে হবে।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর : ১৪.৪, ১৪.৫, ১৪.৬ অংশে বর্ণিত চিত্রনাট্যকাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে নিয়ে আলোচনা প্রস্তুত করুন।

? ১৪.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা চিত্রনাট্যের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

২। বাংলা চিত্রনাট্যকারদের সম্যক পরিচয় তুলে ধরে, যেকোনো একজন বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকারের উপর আলোকপাত করুন।

৩। চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন ও তাঁর চিত্রনাট্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। চিত্রনাট্যকার ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর চিত্রনাট্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

*** *** ***